IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

উনিশ শতকের বাংলা গদ্যচর্চার ধারায় গদ্যশিল্পী রামমোহন রায়

ঘনশ্যাম রায়
সহকারি অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ড. মেঘনাদ সাহা কলেজ
রানিপুর, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর

উনিশ শতকে বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার সান্নিধ্যে এসে বাংলাদেশে যে নবজাগৃতির আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাকে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ নামে চিহ্নিত করা হয়। ইংরেজ শাসনভার গ্রহণ করার সময় থেকেই কোলকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে এই নবজাগরণের অভিঘাৎ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে গদ্য সাহিত্য, পদ্য সাহিত্য ও নাট্য সাহিত্যের ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে, শুধু বাংলা কেন যে-কোনও নবীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যে গদ্যের সাহিত্য-মর্যাদা সেই সময় তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় দীর্ঘ আট শ' বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে সার্বিক ভাবে কবিতার একাধিপত্য বজায় ছিল। তা ছাড়া এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল ছন্দ। অর্থাৎ তখনকার দিনে ছন্দোবদ্ধ রচনার মাধ্যমে আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করাই ছিল সাহিত্যের প্রধান আবেদন। তা ছাড়া সেকালের পদ্যময় সাহিত্যও অনেকাংশে সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালির মণিষায় নতুন ভাবে ভাব-প্রেরণা জাগ্রত হওয়ার ফলে সেই সময় থেকেই সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলি ক্রমশ পুষ্টিলাভ করতে শুরু করে। তাই ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ও মধ্য যুগের আবেগাপ্লুত ভাব-ভাবনার অবসান ঘটে। কিন্তু তখনও তেমন ভাবে নতুন যুগের ভেরি বেজে ওঠে নি। কিন্তু পরবর্তী কালে ইংরেজের আনুকূল্যে মন্ত্রের যুগের পরে যন্ত্রের যুগের সূচনা হওয়ার ফলে প্রাচীন ও মধ্য যুগের দৈবনির্ভর প্রথানুসারী সাহিত্য রচনার ধারার অবসান ঘটে এবং পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা মহানগরী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ প্রসার লাভ করলে চিন্তা ও মনন-সমৃদ্ধ গদ্য সাহিত্য রচনার একটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠতে থাকে। এই সময় শ্রীরামপুর মিশনের প্রভাবে সেই সময় যে গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে, তাকে সেই যুগের প্রথম অবদান বলা যেতে পারে।

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের যথোচিত ব্যবহার এক প্রকার ছিল না বললেই চলে। শুধু কিছু চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ এবং কিছু প্রাত্যহিক কথা-বার্তার মধেই বাংলা গদ্যের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর উনিশ শতকে খ্রিস্টান মিশনারীরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্য রচনায় প্রথম হাত দেন এবং গদ্যে বাইবেলের অনুবাদ করেন।এই পর্বে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীরামপুর মিশনারীর প্রধান কেরী সাহেব কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। এই সময় কেরী তাঁর সহকারি পণ্ডিতদের দিয়ে কলেজে পঠন-পাঠনের জন্য কতগুলি পাঠ্য পুস্তক লিখিয়ে নেন। বলা বাহুল্য, এই পাঠ্য পুস্তকগুলি সেই সময়

সাময়িক ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কিছুটা প্রয়োজন সাধন করলেও সেখানে বাংলা গদ্যের কার্যকরী রূপটি তেমন ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। শ্রীরামপুর মিশনের কর্ণধার হিসেবে কেরী বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বাইবেলের অনুবাদে তাঁর রচিত বাংলা ভাষা অনেকটাই জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ভাষা বেশ দুর্বোধ্য, খটমটে ও অমসৃণ হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া কেরী বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে বাইবেলিয় ইংরেজি বাক্য গঠনের রীতিটিকেই বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে তাঁর গদ্যভাষা তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগে এবং ভাষার অন্বয়গত জড়তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আসলে কেরী প্রমুখ মিশনারীদের বাংলা গদ্য অনুশীলনের পেছনে কোনও উন্নত সাংস্কৃতিক মনষ্কতা বর্তমান ছিল না। তার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির কোনও অভিপ্রায় না থাকার জন্য কেরীর রচিত গদ্য 'খ্রিস্টানী বাংলা' নামে নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্বে মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন করে এবং সেই মুদ্রা যন্ত্রের সহায়তায় ব্যাকরণ ও অন্যান্য নানা গ্রন্থ প্রকাশ করে কেরী বাংলা গদ্যকে কিছুটা নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করেন। এই পর্বে কেরী সংস্কৃত পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বাংলা গদ্যকে কিছুটা সংস্কৃত আদর্শের অনুগামী করে তুলতে পেরেছিলেন। ফলে এই পর্বে বাংলা গদ্যের যাত্রাপথ বেশ কিছুটা সুদৃঢ় ও সুগম হতে পেরেছিল। পরবর্তী কালে এই পথ ধরেই বাংলা গদ্যচর্চার ধারায় রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিত ও গদ্য লেখকদের আবির্ভাব ঘটে।

উনিশ শতকে পাঠ্যপুস্তক রচনার বাইরে বাংলা গদ্যের ব্যবহার সর্বপ্রথম সার্থক ভাবে করলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। আসলে এই প্রচণ্ড কর্মী ও মণীষী প্রকৃত অর্থেই ছিলেন ভারতবর্ষে আধুনিকতার অগ্রদূত। রবীন্দ্রনাথ তাই রামমোহন রায়কে ভারত পথিক বলে অভিহিত করেছেন। ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ ধরে স্মরণাতীত প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে বহু মণীষী ও সাধুসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা নানা ভাষা নানা সম্প্রদায়ে বিচিত্র জীবনধারার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মানবিক ঐক্য ও মিলনের বাণী প্রচার করেছেন। কিন্তু রামমোহন ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ যিনি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের জীবনধারার সমন্বয় সাধন করেছেন। রামমোহন রায় ছিলেন একই সঙ্গে সনাতন ও সমকালীন, ঐতিহ্যবাদী ও প্রগতিশীল ভাবধারা ও চিন্তামনের এক সমুজ্জ্বল বিরাট মানবমূর্তী। আধুনিক কালে বাংলা ভাষার সাহায্যে বাংলাদেশে দার্শনিক জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে তিনি বাংলা গদ্যের পরিমিত পরিপুষ্টি সাধন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই বাংলা গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের অবদান ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় তিরিশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের মধ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১০), 'বেদান্তসার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা' (১৮০৫), 'তলবকার উপনিষদ', 'কেনোপনিষদ, 'ঈশোপনিষদ' (১৮১৬), 'কঠোপনিষদ' (১৮১৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রামমোহনের বিতর্ক ও বিচারমূলক রচনার মধ্যে রয়েছে 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ, দ্বিতীয় ভাগ' (১৮১৯), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সম্বাদ' (১৮২১), 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২), 'পাদরী ও শিষ্যসম্বাদ' (১৮২৩), 'গুরুপাদুকা' (১৮২৩), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩), 'কায়স্থের সঙ্গে মদ্যপান বিষয়ক বিচার' (১৮২৬), 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯) প্রভৃতি। রামমোহনের উক্ত গ্রন্থগুলিতে হয়তো সাহিত্যরস তেমন ভাবে উপস্থিত ছিল না, তবে সেগুলির ভাষা ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং রামমোহনের নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশের উপযোগী। সে যুগের বাংলা গদ্যে রামমোহনের ভাষার মতো প্রাঞ্জলতা গুণ আর কোনও গদ্য শিল্পীর মধ্যে বর্তমান ছিল না। তাই রামমোহনের বাংলা লেখার সমালোচনা করে তাই ঈশ্বর গুপ্ত যথার্থই বলেছেন যে, "দেওয়ানজী (অর্থাৎ রামমোহন) জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোনো বিচার বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত। এজন্য পাঠকরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীমন্ত কুমার জানা, পৃ. ১১৮)

রামমোহন তাঁর সমসাময়িক বাংলা গদ্যের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধেও সম্যক ভাবে পরিচিত ছিলেন। সেই কারণে তাঁর গদ্যের রচনাভঙ্গি অতটা সরল ও সুষম হতে পেরেছিল। সেকালের বাংলা গদ্য মূলত দু'টি বিশিষ্ট দোষের জন্য সুগম হতে পারে নি—প্রথমটি হ'ল ছেদ চিহ্নের স্বল্পতা এবং দ্বিতীয়টি হ'ল দূরান্বয়। রামমোহন

হলেন প্রথম পর্বের গদ্য লেখক। তাই তাঁকে বাংলা গদ্যের রচনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মুশকিল হয়েছিল অন্বয় নিয়ে--শব্দ নিয়ে নয়। তাই তাঁর রচনা পড়তে হলে পাঠককে কী ভাবে অন্বয় করতে হবে, 'বেদান্ত গ্রন্থে'র 'অনুষ্ঠান' অংশে তিনি সেই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, "বাক্যের আরম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিৎ হয়। জে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্য শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন জে হেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না।"(বেদান্ত গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণ,পৃ. ১২-১৩)

বাংলা বাক্যগঠন বিষয়ে রামমোহনের এই সচেতনতার ফলে খণ্ডবাক্য সজ্জার ক্ষেত্রে তিনি অন্বয় ঘটিত অশুদ্ধিগুলিকে মোটের ওপর পরিহার করতে পেরেছিলেন। যেমন, "তৃতীয় বাক্য এই জে / ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না / অতএব সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের কিরূপে হইতে পারে।" (বেদান্ত গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৬)। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, দীর্ঘ বাক্যের ক্ষেত্রে রামমোহনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে একেবারে ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না।

রামমোহন রায়ের প্রথম বাংলা রচনা 'বেদান্তগ্রন্থ'-এ পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন (দাঁড়ি) ছাড়া অন্য কোনও যতি চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। আবার ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে দুই-তিন বা ততোধিক বাক্যের পর পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হওয়ার ফলে অর্থবোধের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই নানা ধরনের অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়। এর ফলে অনেক সময় অন্বয়গত বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। এরপর তিনি 'সহমরণ বিষয়ক' গ্রন্থটির মধ্যে ইংরেজি বাক্য গঠন রীতির হুবহু অনুসরণ করলেন এবং ইংরেজির মতো বাংলা বাক্যের সমাপ্তিতেও 'ফুলস্টপ'(.) ব্যবহার করলেন। যেমন, " ... সংযমপুর্বক তাবৎ কর্মের ফলকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর." কিন্তু পরবর্তীকালে 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের মধ্যে রামমোহন ইংরেজি বাক্য গঠনরীতির অনুবর্তনে এবং বাংলা রীতি অনুসরণে দাঁড়ি ব্যবহার করলেন। যেমন, "ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ এবং মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদছলে এইরূপ কটুক্তি করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্বথা সম্ভব ছিল।"

অতঃপর রামমোহনের গদ্যরীতির অন্যান্য বিশেষত্বগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। রামমোহন মূলত বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদের উপস্থিতির কথা বলেছেন। অর্থাৎ বাংলা বাক্যের সাধারণ পদসজ্জায় কর্তা ও কর্মের পর ক্রিয়া পদের স্থান লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, ইংরেজি বাক্যের পদসজ্জায় রয়েছে কর্তা ও কর্ম পদের মাঝখানে ক্রিয়া পদের অবস্থান। উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা লিখিত গদ্যরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে কেরী কিংবা রামরামের লেখায় এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও রামমোহন এই প্রবণতাকে তাঁর গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে একেবারেই প্রশ্রয় দেন নি। তিনি বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের উপস্থিতি আবশ্যিক বলে মনে করেছেন। যেমন, ''সহমরণ করিলে ত্রিকুল পবিত্র হয়।"

আবার ইংরেজি আদর্শ অনুসারে 'এবং' বা 'আর' দিয়ে বাক্য সূচনার সমকালীন প্রবণতা রামমোহনের মধ্যেও কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, "এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য অঙ্গিরার এই বাক্য...." (সহমরণ পৃ.২)। এ ছাড়া ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ কালের রূপের ক্ষেত্রেও রামমোহনের রচনায় 'ক'-এর অতিরিক্ত সংযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'করিবেক', 'জাইবেক', 'হইবেক', 'পাইবেক' এবং অতীতকালে—'করিলেক' প্রভৃতি।

এ ছাড়া বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও রামমোহন মোটামুটি সমকালীন প্রবণতাকে মেনে নিয়েছিলেন। সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহারে তিনি অনেক সময়েই 'এ'-এর পরিবর্তে 'এতে' বিভক্তি ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'বেদেতে', 'লোকেতে', 'শব্দেতে' প্রভৃতি। আর ষষ্ঠী বিভক্তির 'র'-এর সঙ্গে বহুবচনের 'দিগ', 'দের' প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত করেছেন। এ ছাড়া, রামমোহন বাংলা গদ্যে সন্ধি ও সমাসের ব্যবহারে অত্যন্ত সংযত ছিলেন; সন্ধি ও সমাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কখনও মাত্রাতিরিক্ত দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করে ভাষার সাবলীলতা নষ্ট করেন নি।

রামমোহন মূলত তাঁর ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক বক্তব্যগুলিকে বাঙালির কর্ণমূলে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাই প্রতীচ্যের দর্শন-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে আত্মস্থ করেই তিনি তাঁর গদ্যের মাধ্যমে বিতর্ক সভার কায়দায় একের পর এক প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেছেন। তাই গদ্যরচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক সুষমা সৃষ্টি করার বদলে রামমোহন রায় যুক্তি ও ভাষার সহজবোধ্যতার দিকটির প্রতি বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে আধুনিক যুক্তিনির্ভর বাংলা গদ্যের স্রষ্ঠা বলা যেতে পারে।

<u>সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি</u>:

১। সেন, সুকুমার :*'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য'*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৪১, কলকাতা- ৯

২। সেন, সুকুমার :*'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য় খণ্ড)*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৪০১, কলকাতা- ৯

৩। দাস, ইন্দুভূষণ :*'রামমোহন বিদ্যাসাগর মাইকেল'*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা- ১২

৪। জানা, ড. শ্রীমন্ত কুমার :*'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (আঃ যুগ, ১ম পর্ব)*, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রা. লি.,কোল- ৯

৫। মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা.) :*'পশ্চিমবঙ্গ' (রামমোহন সংখ্যা)- ১৪০৩*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা- ১